নিজেকে জানো

নিজেকে জানো

বয়ঃসন্ধিকাল

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

(১০-১৪ বছর বয়সী)

তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

ভূমিকা

পুষ্টি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

তোমার দেহ

বেড়ে ওঠা

- শারীরিক
- মানসিক
- সামাজিক

উত্ত্যক্ত করা

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন

'নিজেকে জানো' সিরিজের 'বয়ঃসন্ধিকাল', নামের সুদৃশ্য বইটি কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তৈরি ৪টি বুকলেটের মধ্যে অন্যতম। বইটি রচনায় অনেক ব্যক্তি ও সংস্থা অবদান রেখেছেন। আইসিডিডিআরবি'র ফ্যামিলি হেলথ্ রিসার্চ প্রজেক্ট কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বইগুলোর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২ ও ২০০৫ সালে তৈরি ও প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালে আইসিডিডিআরবি'র ট্র্যাকশন (TRAction) প্রজেক্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডাটা ব্যাংক প্রশ্নসম্ভার থেকে তথ্য নিয়ে বর্তমানে বইগুলোর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই সিরিজের অন্যান্য প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে 'নতুন বোধ, নতুন অনুভূতি' 'যৌনরোগ ও এইচআইভি-এইডস' ও 'বিয়ে এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য'। ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় এআরএইচ ওয়ার্কিং গ্রুপের নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ বইটি প্রণয়ন করেছে:

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
- আইসিডিডিআর'বি
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (বিএসএমএমইউ)
- ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ্ নিউট্রিশন (আইপিএইচএন)
- আন্ডার প্রিভিলেজড্ চিলড্রেন'স এডুকেশন প্রোগ্রামস্ (ইউসিইপি)
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)
- ইউনাইটেড নেশনস্ পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)
- ইউনাইটেড নেশনস্ চিলড্রেন'স ফান্ড (ইউনিসেফ)
- ইউনাইটেড স্টেট্স্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)
- ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এফপিএবি)
- পপুলেশন কাউন্সিল
- সেইভ দ্যা চিলড্রেন
- সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)
- প্ল্যান বাংলাদেশ
- মেরী স্টোপস্ বাংলাদেশ
- স্কেলিং আপ নিউট্রিশন (সান)
- এমিনেন্স
- কনসার্নড্ উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভলপমেন্ট (সিডব্লিউএফডি)
- ব্র্যাক
- বাংলাদেশ নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (বিকেএমআই)
- বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (বিসিসিপি)
- এনজিও হেলথ্ সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (এনএইচএসডিপি)
- বাংলাদেশ উইমেনস হেলথ্ কোয়ালিশন (বিডব্লিএইচসি)
- এফএইচআই ৩৬০

বইটি রচনা ও প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি এটি পর্যালোচনা করেছেন।

এই বইটি রচনা, প্রণয়ন ও পর্যালোচনায় যারা মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

তোমরা জানো একটি শিশু জন্মের পর ধীরে ধীরে বড় হয়। বড় হতে হতে ছোট্ট শিশুটি কৈশোরে, তারপর যৌবনে পৌঁছায়, এরপর একসময় বুড়ো হয়ে যায়। শিশুকাল আর যৌবনের মাঝামাঝি সময়কে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

কৈশোর হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রাপ্তবয়সের শুরু পর্যন্ত সময় (সাধারণভাবে ১০-১৯ বয়স পর্যন্ত)। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের কিশোর ও মেয়েদের কিশোরী বলা হয়। এ সময় শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের বিকাশই খুব দ্রুত হয়ে থাকে।

তোমরা দেখতে পাবে যে, দশ বছর বয়স থেকে বড় হওয়া শুরু হলেও কেউ তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে, কেউবা আবার কিছুটা দেরিতে। এতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ, একেক জন মানুষের শরীর একেক রকম। একজন মানুষের বড় হয়ে ওঠা নির্ভর করে তার শরীরের গঠন আর পুষ্টির ওপর।

এ বয়সে ছেলেরা লম্বা হতে থাকে, তাদের কাঁধ চওড়া হয়, গলার স্বরের পরিবর্তন হয় ও মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করে। একইভাবে মেয়েদের শরীরও বাড়তে শুরু করে, মেয়েলি পরিবর্তনগুলো শুরু হয় এবং চেহারায় লাবণ্য আসে। এ সবই বড় হয়ে ওঠার লক্ষণ।

বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় ছেলে আর মেয়েদের মনে পরিবর্তন আসে। এ বয়সে তোমাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আবেগ আর অস্থিরতা কাজ করে। কখনো মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে, আবার কখনো মন খুশিতে ভরে যায়। কেউ হয়ে ওঠে অভিমানী, কেউবা কৌতূহলী। কেউ কেউ সৌন্দর্য সচেতন হয়ে ওঠে, সুন্দর জামা-কাপড় পরতে পছন্দ করে এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কেউ আবার একা থাকতে পছন্দ করে- কারো সামনে যেতে চায় না। তবে মনে রেখো এই পরিবর্তনগুলো সাময়িক। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে সব স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কৈশোর কৌতূহলের বয়স। এ সময় তোমাদের নিজেদের শরীর, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করতে পারে। এ সময় তোমাদের কিছু জানতে ইচ্ছা করলে বা তোমরা কোনো সমস্যায় পড়লে বাবা-মা বা বড়দের সাথে এ ব্যাপারগুলো আলাপ করতে অস্বস্তি বোধ করো এবং সমবয়সি বা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো। এ বন্ধুরা যেহেতু তোমাদেরই বয়সি তাই তাদের কাছে সবসময় সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরীরা যাদের মনে বিভিন্ন বিষয়ে হাজারো প্রশ্ন জমা হয়ে আছে তাদের জন্যই এ বইটি লেখা হয়েছে। আমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো জানতে বিভিন্ন সময় গবেষণা করেছি। এ বইয়ের প্রশ্নগুলোও তোমাদের মতো ছেলে-মেয়েরা কিছুদিন আগে করা গবেষণায় আমাদের জিজ্ঞাসা করেছে। ঐ প্রশ্নগুলো এবং তাদের উত্তর নিয়েই এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ সাজানো হয়েছে। এ বইটি ছাড়াও এ রকম আরো তিনটি বই আছে। এই বইগুলো তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহল মেটাবে বলে আশা করি।

পুষ্টি

ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখতে হলে আমাদের কি কি করণীয়?

শরীর সুস্থ রাখতে হলে পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার যেমন- ডাল, ছোট মাছ, শাকসবজি, ফলমূল, ডিম, দুধ, মাংস, গুড় ইত্যাদি খেতে হবে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করা এবং সেই সাথে নিয়মিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খেলাধুলা করা দরকার।

আমার অসুস্থ এবং দুর্বল লাগে কেন?

অনেক কারণে তোমাদের দুর্বল লাগতে পারে। এর মধ্যে রক্তস্বল্পতা, অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগ অন্যতম। পরিমিত পরিমাণে ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, বিশ্রাম নেয়া ও ব্যায়াম করার পরেও অসুস্থ বা দুর্বল লাগলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।

কৈশোরে শরীরের যথাযথ বৃদ্ধি ও সুস্থ খাবারের জন্য পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও শরীরে রোগ প্রতিরোধক শক্তি সঞ্চয় করে। পুষ্টি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করা থেকে শুরু করে খাদ্য পরিপাক ও শোষিত হয় অর্থাৎ পুষ্টি বলতে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের ফলাফলকে বোঝায়।

পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের শ্রেণি বিভাগ

ক. শক্তিদায়ক খাবার

- শ্বেতসার বা শর্করা সমৃদ্ধ খাবার, যেমন : চাল, গম, ভুট্টা, চিনি, গুড়, আলু, মধু ইত্যাদি
- তেলসমৃদ্ধ খাবার, যেমন : তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি

খ. শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার

- প্রাণিজ আমিষ : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধজাত খাবার
- উদ্ভিজ আমিষ : বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম, সীমের বীচি, মটরশুঁটি, তৈলবীজ (তিল/সরিষা) ইত্যাদি

গ. রোগ প্রতিরোধক খাবার

- খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ও খণিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার। যেমনঃ গাঢ়, রঙিন শাক-সবজি, বিভিন্ন ফলমূল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি

ঘ. পানি ও তরল খাবার

- সকল ধরনের তরল পানীয় যেমনঃ বিশুদ্ধ পানি, দুধ, ডাবের পানি, ভাতের মাড়, ডালের পানি, শরবত ইত্যাদি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা বয়ঃসন্ধিকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সময় ছেলে-মেয়েদের ঘাম বেশি হয় এবং চামড়া তেলতেলে হয়। শরীরের ঘামে, বিশেষ করে বগলের ঘামে বা কাপড়ের নিচে ঢেকে থাকা অঙ্গে কিছুটা দুর্গন্ধ হতে পারে। তাই শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি।

শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হাত, পা, চোখ, কান, নাক, চুল, নখ যেমন প্রতিদিন পরিষ্কার রাখা দরকার তেমন ভাবে শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকা থাকে, প্রতিদিন সেগুলোও পরিষ্কার রাখতে হয়। এ জন্য প্রতিদিন পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে গোসল করা, যৌনাঙ্গ পরিষ্কার রাখা, হাত-মুখ ধোয়া, পরিষ্কার কাপড় পরা এবং পরিষ্কার জিনিস ব্যবহার করা দরকার।

ছোটবেলায় মুখে ব্রণ ছিল না, বড় হলে কেন ব্রণ হয়? বিশেষ করে ১২ বছরের পর থেকে ছেলে বা মেয়েদের মুখে ব্রণ দেখা যায়। এর প্রতিকার কী?

কারো কারো মুখে এ সময় ব্রণ বা দানা দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ ব্রণ আকারে ছোট হয় এবং এমনিতেই চলে যায়। ব্রণে হাত দেয়া উচিত নয়। এ বয়সে ব্রণ হবার মূল কারণ শরীরে হরমোনের পরিবর্তন। তাছাড়া, মানসিক দুশ্চিন্তা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অতিরিক্ত চা, কফি ও ধূমপান করার কারণেও ব্রণ হতে পারে। মুখ তেলতেলে থাকলে ব্রণ হয়। প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি খেলে, বেশি করে পানি পান করলে এবং মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখলে ব্রণ কম হয়। অল্প পরিমাণ সাবান দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ ধুয়ে ভালোভাবে মুছে ফেলবে। নখ দিয়ে কখনও ব্রণ খুঁটবে না। ব্রণ থেকে বেশি দাগ হয়ে গেলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবে।

তোমার দেহ

তোমাদের বয়সি ছেলে-মেয়েদের নিজেদের দেহ সম্পর্কে কৌতূহল থাকে। দেহের ভিতরে কি আছে তা তোমরা জানতে চাইতে পারো। নিজের দেহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভালো এবং এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই।

তোমরা জানো নতুন একটি শিশু পৃথিবীতে আসার জন্য নারী ও পুরুষ দু'জনেরই প্রয়োজন। **গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম হওয়ার জন্য এই পুরো প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অঙ্গগুলো জড়িত সেগুলোকে একসাথে প্রজননতন্ত্র বলে।**

নারী ও পুরুষভেদে প্রজননতন্ত্রকে মেয়েদের প্রজননতন্ত্র এবং ছেলেদের প্রজননতন্ত্র বলা হয়।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্র

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের অনেকগুলি অংশ রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি বাইরে থেকে দেখা যায় এবং কয়েকটি অংশ দেহের ভিতরে থাকে, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

ছেলেদের দেহের নিচের দিকে একটি ঝুলন্ত থলি আছে, যাকে অণ্ডকোষের থলি বলে। এ থলির ভিতরে দুটো গোলাকার অণ্ডকোষ বা টেস্টিস ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একটি ছেলে যখন বড় হয় তখন এ অণ্ডকোষ থেকেই শুক্রাণু তৈরি হয়। এই শুক্রাণু যৌনমিলনের মাধ্যমে মেয়েদের ডিমের সাথে মিলিত হয়ে সন্তান সৃষ্টি হয়। শুক্রাণু তৈরির এ প্রক্রিয়া সারাজীবন চলতে থাকে।

অণ্ডকোষে শুক্রাণু তৈরি হবার পর শুক্রবাহী নালী দিয়ে বের হয়ে এ শুক্রাণু বীর্যের সাথে মিলিত হয়। ছেলেদের তলপেটে দুটি বীর্যথলি আছে যা থেকে এক রকম পিচ্ছিল রস তৈরি হয়। এ রসকেই বীর্য বা সিমেন (Semen) বলে। ছেলেরা বড় হবার পরে যৌন উত্তেজনা হলে পুরুষাঙ্গ থেকে এ বীর্য বের হয়।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের একটি বিশেষ অংশ হলো পুরুষ লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ যা বাইরে থেকে দেখা যায়। এর আকার বা আকৃতি সবার এক রকম হয় না। বীর্য এবং প্রস্রাব একই পথে অর্থাৎ পুরুষ লিঙ্গ দিয়ে বের হয়, তবে তারা এক সঙ্গে বের হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষাঙ্গ নরম থাকে কিন্তু কোনো কারণে উত্তেজিত হলে এটি শক্ত এবং বড় হয়ে যায়।

মেয়েদের প্রজননতন্ত্র

মেয়েদের প্রজননতন্ত্রের অনেকগুলো অংশ রয়েছে। এদের মধ্যে একটি অংশ বাইরে থেকে দেখা যায় এবং কিছু অংশ যা ভিতরে রয়েছে, তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। যেমন- মেয়েদের তলপেটের দুই পাশে দুটি ডিমের থলি আছে। এই ডিমের থলি দুটিকে ডিম্বাশয় বা ওভারি বলে। প্রতিটি মেয়ে যখন বড় হয় তখন প্রত্যেক মাসে এই ডিমের থলিতে একটি করে ডিম পরিপক্ক হয়।

দুই ওভারির মাঝখানে, তলপেটে একটি জরায়ু আছে। এ জরায়ুতেই মাসিকের রক্ত তৈরি হয় এবং শিশু বড় হয়। জরায়ুর উপরের দিকে দুই পাশ থেকে দুটি নালী শুরু হয়ে ওভারি বা ডিমের থলির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ নালী দুটিকে ডিম্ববাহী নালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউব বলে। প্রতি মাসে ডিমের থলিতে যখন একটি করে ডিম পরিপক্ক হয়, তখন তা এই নালী দিয়ে জরায়ুতে আসে।

জরায়ুর নিচে মেয়েদের যোনিপথ আছে। এ যোনিপথ বাইরে এসে যোনিপথের মুখ হিসেবে শেষ হয়েছে। মেয়েদের দেহের নিচের দিকে যোনিপথের মুখ ছাড়াও আরো দুটি ছিদ্রপথ আছে। যোনিপথের সামনের ছিদ্রটি মূত্রনালীর মুখ, যার মাধ্যমে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে। যোনিপথের পিছনের ছিদ্রটি পায়ুপথের মুখ, যার মাধ্যমে মলত্যাগ করা হয়।

এ যোনিপথের অনেকগুলো কাজ রয়েছে। যেমন- প্রতিমাসে মাসিকের রক্ত এ পথ দিয়ে বের হয়। এ পথে যৌনমিলন হয় এবং এ পথেই একটি শিশু মায়ের পেট থেকে বের হয়ে আসে।

বেড়ে ওঠা : শারীরিক

সবাই একভাবে লম্বা হয় না কেন?

কৈশোরকালীন সময়ে শরীর দ্রুত বাড়ে। এই দ্রুত বৃদ্ধি ১০ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। ছেলে-মেয়েদের শারীরিক উচ্চতা ও গঠন কেমন হবে তা নির্ভর করে খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টির উপর। তবে, এ বয়সে সবার বৃদ্ধি এক রকম হয় না। তাই দেহের বৃদ্ধির জন্য এ সময় প্রচুর আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। দেহের চাহিদা অনুযায়ী এ সময়ে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করা হলে শরীরের বৃদ্ধি পুরোপুরি হয়। বংশগত ও পরিবেশগত কারণে এই বৃদ্ধির গতিতে তারতম্য হতে পারে। যার কারণে সবাই একভাবে বাড়ে না বা লম্বা হয় না। যেমন, কারো বাবা-মা যদি লম্বা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তাদের সন্তানও লম্বা হয়, আবার বাবা-মা কারও উচ্চতা কম হলে সন্তানেরও উচ্চতা কম হতে পারে। এসব কারণে এ বয়সে (১০-১৯ বছর) সবার বৃদ্ধি একরকম হয় না। তবে এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। সুষম খাদ্য গ্রহণ ও নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শারীরিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

আমার বন্ধু রবিন এবং আমি একই বয়সের, তারপরও সে দেখতে কেন ছোট? ১৩/১৪ বছরের ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মেয়েদের কেন বড় দেখা যায়?

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ অনেক সময় দ্রুত বাড়ে আবার কেউ ধীরে ধীরে বাড়ে। এ বৃদ্ধি কারো কারো ক্ষেত্রে একটু অল্প বয়স হতে শুরু হয় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে দেরিতে শুরু হয়। সেজন্য একই বয়সের একটি ছেলেকে একটি মেয়ের তুলনায় অথবা একটি ছেলেকে আরেকটি ছেলের তুলনায় ছোট কিংবা বড় দেখায়।

বয়ঃসন্ধিকালে তোমাদের দেহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। তোমাদের দেহের এসব পরিবর্তন হরমোনের কারণে হয়ে থাকে। **হরমোন হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা দেহে তৈরি হয়।** মনে রেখো, ছেলে-মেয়ে উভয়েরই হরমোন আছে, তবে তাদের হরমোন আলাদা এবং এ কারণে তাদের পরিবর্তনও এক রকম নয়।

হরমোনের কারণে এ সময় ছেলেদের মুখে দাড়ি ও গোঁফ গজায় এবং দেহে লোম বেশি হয়। অপরদিকে, মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি পায়। ছেলে ও মেয়েদের বগলে ও যৌনাঙ্গে এবং কোনো কোনো ছেলের বুকেও লোম গজায়। ছেলেদের বগল ও যৌনাঙ্গে লোম গজাবার ২/৩ বছর পর দাড়ি ও গোঁফ গজায়। লোম বা দাড়ি-গোঁফ সবার সমান হয় না এবং এর উপর কারো পুরুষত্ব নির্ভর করে না।

মেয়েদের বেড়ে ওঠা : শারীরিক

মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন কখন শুরু হয়? মেয়েদের এ ধরনের পরিবর্তন কেন হয়?

যখন একটি মেয়ে ১০-১২ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন তার শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। এই বয়সে মেয়েদের দেহে হরমোন তৈরি হয়। হরমোনের কারণে মেয়েদের শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেমন- উচ্চতা বাড়ে, মাসিক শুরু হয়, স্তন বড় হয়, বগলে ও যৌনাঙ্গে লোম গজায় ইত্যাদি।

এই পরিবর্তনগুলোই হচ্ছে একটি মেয়ের বড় হয়ে ওঠার স্বাভাবিক লক্ষণ।

মাসিক বা ঋতুস্রাব

মাসিক বা ঋতুস্রাব মেয়েদের দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষণ। সাধারণত ১২-১৩ বছর বয়সে মাসিক শুরু হয়। তবে কারো কারো এর আগে বা পরেও হতে পারে। ৪৫-৪৯ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মেই মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিমাসেই মাসিক হয়ে থাকে এবং তা ৩ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়। মেয়েদের প্রতি ২৪ থেকে ৩২ দিন অর্থাৎ গড়ে ২৮ দিন পর পর মাসিক হয়। একে মাসিকচক্র বলে। মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকেই মাসিকচক্র শুরু হয়। মাসিকের প্রথম দিন থেকেই ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু তৈরি হতে শুরু করে। মাসিক হওয়ার পরে মেয়েরা প্রজনন অর্থাৎ সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করে। মাসিক নিয়ে ভয় বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

মাসিক কেন হয়?

মেয়েরা যখন বড় হয় তখন প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু বের হয়ে ডিম্ববাহী নালীতে আসে। একই সময় জরায়ুতে রক্তে ভরা নরম পর্দা তৈরি হয়। যদি এ সময় যৌনমিলন হয় তাহলে শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণ তৈরি হয়। এই ভ্রূণ রক্তে ভরা নরম পর্দায় গিয়ে বসে ও ধীরে ধীরে বড় হয়ে শিশুতে পরিণত হয়।

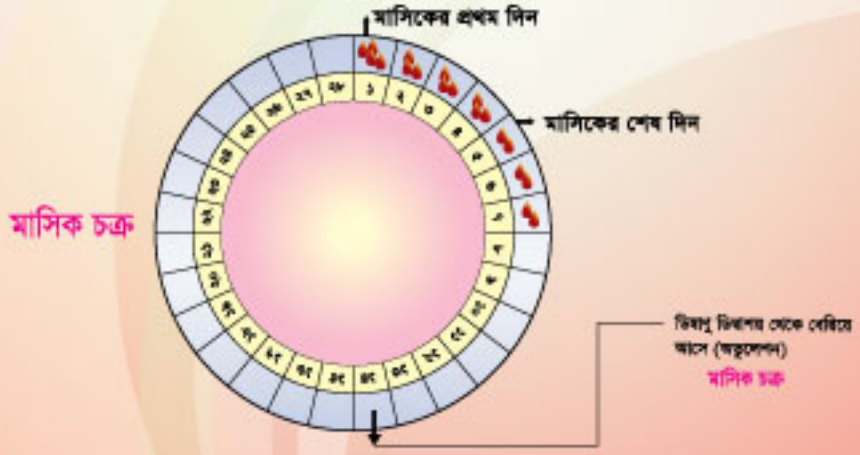

যদি শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলন না হয়, তাহলে এই পর্দার আর প্রয়োজন হয় না। তখন এই রক্তে ভরা পর্দা ডিম্বাণুসহ মাসিক হিসেবে যোনিপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কোনো আঘাত বা অসুখের কারণে এই রক্ত পড়ে না। এ বয়সে একটি মেয়ে যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করেছে, মাসিক তারই প্রমাণ।

পিরিয়ড বা মাসিক কয়দিন হয়?

স্বাভাবিক অবস্থায় মাসিক প্রতিমাসেই হয়ে থাকে এবং ৩ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়। সাধারণত মেয়েদের প্রতি ২৪ থেকে ৩২ দিন অর্থাৎ গড়ে ২৮ দিন পর পর মাসিক হয়। একে মাসিক চক্র বলে। কারো কারো ক্ষেত্রে এ ২৮ দিনের চক্রটি কম বা বেশি হতে পারে।

আমাদের কেন মাসিক হয়, ওদের (ছেলেদের) কেন হয় না?

মেয়েদের শরীরে জরায়ু থেকে প্রতি মাসে মাসিক হয়। যেহেতু মেয়েদের মতো ছেলেদের জরায়ু নেই, তাই তাদের মাসিক হয় না।

যখন আমার প্রথম মাসিক শুরু হলো তখন আমি ভাবলাম এ আমার কি হলো?

মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সাধারণত মেয়েদের ১২-১৩ বছর বয়সে মাসিক শুরু হয়। তবে কারো কারো এর আগে বা পরেও হতে পারে। এজন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে মাসিক শুরু হওয়ার আগে এ ব্যাপারে জানা থাকে না বলে প্রথম মাসিকের সময় অনেকেই ভয় পায়। মেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে তখন মা অথবা অন্যান্য মহিলা যেমন- বড় বোন, ভাবি তাকে আগে থেকে এ ব্যাপারটা যদি বুঝিয়ে বলেন তবে মেয়েটি লজ্জা ও ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে।

এই রক্ত পড়া কি বন্ধ হবে না? এটা আবার কি ঝামেলা?

অধিকাংশ মেয়েরা মনে করে যে, মাসিক একটি ঝামেলার ব্যাপার কিন্তু এটি জীবনের একটি বাস্তব সত্য। এই রক্ত পড়া সাধারণত ১২-১৩ বছর থেকে শুরু হয় এবং ৪৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ হয়ে যায়।

মাসিকের রক্তের পরিমাণও কম-বেশি হতে পারে। মাসিকের রক্তের পরিমাণ কতটুকু হবে বা কতদিন মাসিক থাকবে তা নির্ভর করে হরমোন, শারীরিক গঠন, রক্তের পরিমাণ, বংশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ওপর। মেয়েদের প্রথম মাসিক হলে কোনো কোনো সময় তা অনিয়মিত হয়। কোনো মাসে হয়, আবার কোনো মাসে হয় না। অধিকাংশ মেয়ের কয়েক বছরের মধ্যে এই অনিয়মগুলো দূর হয়ে যায়। দীর্ঘদিন এই অনিয়ম চলতে থাকলে অবশ্যই একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

মাসিকের সময় কীভাবে চলতে হয়? মাসিক হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন কেন?

মাসিকের সময়ে রক্ত যাতে বাইরে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড, পরিষ্কার কাপড় বা তুলা ব্যবহার করতে হয়। এগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে কয়েকবার বদলাতে হয়। এছাড়া নানা মাপের জাংগিয়া বা প্যান্টি পাওয়া যায়। কাপড় বা তুলার সাথে এগুলো ব্যবহার করা যায়। এসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, যৌনাঙ্গ পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিচ্ছন্ন শুকনা কাপড় পরতে হবে, তা না হলে একই কাপড় যদি বারবার ব্যবহার করা হয় তবে সেগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে/বাতাসে শুকাতে হবে। মাসিক চলাকালীন সময়ে নিয়মিত গোসল করতে হবে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতে হবে, পুষ্টিকর সব ধরনের খাবার খেতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে।

মাসিকের সময় কাপড় ব্যবহার করা ভালো, নাকি প্যাড (স্যানিটারি ন্যাপকিন)?

মাসিকের সময় পরিষ্কার তুলা বা প্যাড ব্যবহার করাই ভালো। তবে তা সম্ভব না হলে পরিষ্কার শুকনা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। মাসিকের সময় কাপড় বা প্যাড না ব্যবহার করলে মাসিকের রক্ত কাপড় বা বিভিন্ন জায়গায় লেগে যেতে পারে। এটি একদিকে যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি বিব্রতকর।

মাসিকের কাপড় কিভাবে ব্যবহার করবো?

মাসিকের সময় পরিষ্কার প্যাড ব্যবহার করা সম্ভব না হলে পরিষ্কার শুকনা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তা পরিষ্কার ও শুকনা থাকা জরুরি। কাপড় প্রতিবার ব্যবহারের পরে ভালোভাবে সাবান ও গরম পানিতে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। কারণ কড়া রোদে শুকালে রোগ জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে না। তা না হলে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকবে। কাপড়, তুলা বা প্যাড যেটাই ব্যবহার করা হোক না কেন নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রয়োজন মতো তা পরিবর্তন করতে হবে। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে বেশি বার, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে কম বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে।

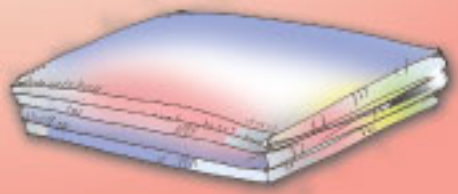

মাসিকের সময় পেট ব্যথা করে কেন? মাসিকের সময় পেট ব্যথা করলে কি করবে?

মাসিকের সময় কারো কারো কোমরে বা পেটে অল্প অল্প ব্যথা হতে পারে। শরীরের এক বিশেষ হরমোনের জন্য মাসিকের সময় জরায়ুর সংকোচন (ছোট হওয়া) ও প্রসারণ (বড় হওয়া) ঘটে। ফলে তলপেটে বা কোমরে ব্যথা অনুভূত হয়। তাছাড়া প্রথম প্রথম মাসিক হলে মেয়েরা অস্বস্তিতে ভুগতে পারে। এ সময় বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম বা গরম সেক ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। তবে স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হলে, বেশি ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে।

মাসিক হলে চলতে ফিরতে বাধা দেয়া হয় কেন?

মাসিক একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই মাসিক হলে স্বাভাবিক চলাফেরায় কোনো বাধা নেই। এসময় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে।

মাসিক হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায় কেন?

স্বাভাবিকভাবে মাসিকের সময় শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যায়। যদি কেউ আগে থেকে অপুষ্টিতে ভোগে তাহলে এই রক্ত বের হয়ে যাওয়ার ফলে রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে, ফলে শরীর দুর্বল বা ক্লান্ত লাগতে পারে। মাসিকের সময় মাছ, মাংস, ডিমসহ সব ধরনের পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তবে খুব বেশি রক্ত গেলে বা শরীর দুর্বল হয়ে পড়লে দেরি না করে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

মাসিকের সময় কি কি কাজ করা যাবে না? মাসিকের সময় কি দৌড়-ঝাঁপ বা ভারি কাজ করা যায়?

মাসিক একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সময় স্বাভাবিক সব কাজ করা যায়। এ সময় জরায়ুর সংকোচন-প্রসারণ হতে থাকে, তাই বেশি দৌড়-ঝাঁপ করলে বা ভারি কাজ করলে জরায়ুর ওপর চাপ পড়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে মাসিকের রক্ত ঝরার পরিমাণ বেশি হতে পারে। এছাড়া মাসিকের সময় প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরতে থাকে এবং কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করতে হয়। ফলে পরার কাপড়ে রক্ত লেগে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাই বেশি দৌড়-ঝাঁপ বা ভারি কাজ না করাই ভালো। এ সময় দৈনন্দিন স্বাভাবিক চলাফেরা এবং পারিবারিক সব কাজ করা যাবে।

"মিনস্ হলে অস্থির লাগে, ভালো লাগে না, চলাফেরা করতে মন চায় না কেন? এক জায়গায় বসে থাকতে ইচ্ছা করে"- এরকম লাগে কেন?

প্রথম প্রথম মিনস্ বা মাসিক হলে একটু অস্বস্তি লাগতে পারে এবং চলাফেরা করতে ও সবার সামনে যেতে বিব্রতবোধ হতে পারে। তবে মানসিকভাবে এই শারীরিক পরিবর্তনকে মেনে নিতে হবে। প্রথম দিকে একটু সমস্যা হলেও আস্তে আস্তে তা কেটে যাবে।

মাসিকের ব্যথা, মাথা ব্যথার জন্য আমাদের কি করা উচিত? মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হলে কি করা উচিত?

মাসিকের সময়ে অনেকের কোমরে বা পেটে ব্যথা অথবা মাথা ব্যথা হতে পারে। বিশ্রাম, গরম সেক ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যথা যদি বেশি হয় তবে অবশ্যই ডাক্তার দেখিয়ে ব্যথা কমানোর ঔষধ খেতে হবে। এ সময় স্বাভাবিক চলাফেরা ও কাজকর্ম করা যায়।

মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হলে বোতলে গরম পানি নিয়ে সেক দিলে আরাম পাওয়া যায়। এ সময় স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

আমি শুনেছি মাসিকের সময় মাছ-মাংস খাওয়া যায় না, টক খাওয়া যায় না কেন? মাসিকের সময় আমাদের কেন পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় না?

মাসিকের সময় মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া যাবে না-এটি একবারেই ঠিক নয়। বরং এই সময় বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে, আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তা না হলে রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। অনেকে মনে করে মাসিকের সময় টক জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না- এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা লেবু, কমলা, তেঁতুল, আমলকি, জলপাই ইত্যাদি টক জাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরে আয়রন-এর শ্বসন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। কোনো খাবারই মাসিকের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে না। কিশোর বয়স শরীর গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আর শরীর গঠনে সাহায্য করে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার। সুতরাং এ বয়সে বিশেষ করে মাসিকের কারণে কোনো খাবার বেছে খাওয়া বা বাদ দেয়া উচিত নয়।

যোনিপথে স্রাব নির্গত হয় কেন? এ ধরনের রোগ হলে আমি কি করবো? এর কি চিকিৎসা দরকার?

মেয়েরা যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছে তখন তাদের যোনিপথ থেকে এক ধরনের স্বচ্ছ সাদা বা হালকা হলদে স্রাব বের হতে শুরু করে। স্রাবের পরিমাণ কোনো মেয়ের কম, আবার কোনো মেয়ের বেশি হতে পারে। যোনিস্রাব বের হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

স্বাভাবিক নিয়মেই স্রাবের পরিমাণ কখনো বাড়ে বা কখনো কমে। স্রাব কখনও শুষ্ক ও আঠালো, আবার কখনও ভেজা ও পাতলা হতে পারে। যেহেতু যোনিপথে স্রাব হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার তাই এর জন্য চিন্তিত হবার বা চিকিৎসা নেবার কোনো দরকার নেই।

তবে যোনিপথে বা জরায়ুতে কোনো সংক্রমণ হলে প্রচুর পরিমাণে গন্ধযুক্ত সবুজ বা হলুদ স্রাব বের হয়। অনেক সময় এর সাথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

ছেলেদের বেড়ে ওঠা : শারীরিক

মেয়েরা ১৩/১৪ বছর বয়সে বড় হয়, ছেলেরাও কি বড় হয়? আমি কি করে বুঝবো যে, আমার সমবয়সি একটি ছেলে বড় হচ্ছে?

সাধারণত ১০-১২ বছর বয়সে একটি ছেলের শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয়। যেমন- উচ্চতা বাড়তে থাকে, কাঁধ চওড়া হয় এবং মাংসপেশি শক্ত হতে থাকে। ছেলেরা যে বড় হচ্ছে তার লক্ষণ হলো দাড়ি-গোঁফ গজানো। এ সময় গলার স্বরেরও পরিবর্তন হয়।

বড় হলে ছেলেদের গলার স্বর ভেঙে মোটা হয়। এটা কেন হয়?

গলার স্বর মানুষের ভোকাল কর্ড নামক অঙ্গের ওপর নির্ভর করে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের ভোকাল কর্ড পরিবর্তিত হয়। যার ফলে তাদের গলার স্বর ভেঙ্গে যায় এবং ভারি হয়।

ছেলেদের দাড়ি-মোচ ওঠে, মেয়েদের দাড়ি- মোচ ওঠে না কেন?

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের দেহে হরমোন বা রস তৈরি হয়। দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন হরমোনের কারণে হয়। ছেলেমেয়ে উভয়েরই হরমোন আছে, তবে তাদের হরমোন আলাদা এবং এ কারণে তাদের শারীরিক পরিবর্তনগুলোও ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে প্রাকৃতিকভাবে ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ ওঠে, মেয়েদের ওঠে না।

স্বপ্নদোষ

**অনেকের স্বপ্নদোষ হয়। কেন হয়?
(কীভাবে স্বপ্নদোষটা শুরু হয়)?**

একটি ছেলে যখন ১২-১৩ বছর বয়সে পৌঁছায় তখন তার 'বীর্য' তৈরি হতে শুরু করে। 'বীর্য' যখন ঘুমের মধ্যে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে স্বপ্নদোষ বলে। একটি ছেলে যে বড় হচ্ছে স্বপ্নদোষ তারই প্রমাণ। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোনো কোনো সময় যৌনবিষয়ক চিন্তা বা স্বপ্নের সাথে স্বপ্নদোষের সম্পর্ক থাকে। তবে মনে রাখতে হবে বাংলায় 'স্বপ্নদোষ' বলা হলেও এটি দোষের নয়।

স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সাধারণত একটি ছেলে যখন ১২-১৩ বছর বয়সে পৌঁছায় তখন তার বীর্য থলিতে বীর্য (ধাতু) তৈরি হতে শুরু করে এবং স্বপ্নদোষ হলে স্বাভাবিক নিয়মে শরীর থেকে বীর্য বের হয়ে আসে। বীর্য যখন ঘুমের মধ্যে যৌনাঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তাকে স্বপ্নদোষ বলে। যৌনবিষয়ক চিন্তা করলে বা বিভিন্ন উত্তেজক স্বপ্ন দেখলে কখনো কখনো স্বপ্নদোষ হতে পারে। একটি ছেলে যে বড় হচ্ছে স্বপ্নদোষ তারই লক্ষণ। যদিও কারো স্বপ্নদোষ না হওয়াও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় এবং এর অর্থ এই নয় যে, তার দেহে বীর্য ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে না।

**স্বপ্নদোষ কি কোনো অসুখ?
অনেকে বলে স্বপ্নদোষ হলে শরীরের সব শক্তি বের হয়ে যায়।
এটা শরীরের ভিতর ধরে রাখার কোনো উপায় আছে কি?**

স্বপ্নদোষ কোনো অসুখ নয়। বয়ঃসন্ধিকালে স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বপ্নদোষের মাধ্যমে শরীরের কোনো শক্তি বের হয় না এবং শরীর দুর্বলও হয় না। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে ছেলেদের শরীরের ভিতর বীর্য তৈরি হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মেই আবার তা শরীর থেকে বের হয়ে যায়। শরীরের ভিতরে বীর্য ধরে রাখার কোনো উপায় নেই। তাই এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে স্বপ্নদোষ হয়ে কাপড় ভিজে যাওয়ায় অনেক ছেলেই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে। কিন্তু স্বপ্নদোষ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। প্রায় সব ছেলেরই এ রকম হয়ে থাকে এবং এটি তোমার বেড়ে ওঠায় কোনো বাধা নয়। তবে যদি কেউ প্রয়োজন মনে করে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে।

স্বপ্নদোষ হলে কি করতে হয়?

স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং এটি কোনো রোগ নয়। তাই এর কোনো চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই। স্বপ্নদোষ শারীরিক কোনো অসুবিধা করে না অথবা শরীরকে দুর্বলও করে না এবং এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে অত্যধিক স্বপ্নদোষ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। স্বপ্নদোষের ফলে বীর্য বের হয়ে কাপড় নোংরা হয়ে যেতে পারে তাই এই সময় অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অত্যধিক পরিশ্রম করলে কি স্বপ্নদোষ হয়?

অত্যধিক পরিশ্রমের সাথে স্বপ্নদোষের কোনো সম্পর্ক নেই।

শুনেছি ছেলেদের রক্ত থেকে বীর্য তৈরি হয়। কথাটা কি ঠিক? (ছেলেদের রক্ত হতে কি বীর্য তৈরি হয়?)

রক্ত থেকে বীর্য তৈরি হয় না। ১২-১৩ বছর বয়স থেকে বীর্য তৈরি শুরু হয় এবং এটি সারা জীবন চলতে থাকে। একটি ছেলে যে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে, বীর্য বের হওয়া তারই প্রমাণ। তোমার বীর্য কোনো সময়ই ফুরিয়ে যাবে না। তাই কারো স্বপ্নদোষ হলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বয়ঃসন্ধিকালে লিঙ্গ শক্ত হওয়ায় তুমি হয়তো অবাক হতে পারো এবং অস্বস্তি বোধ করতে পারো। এ ধরনের অস্বস্তি থেকে তোমার মন অন্যদিকে নেওয়ার জন্য এ সময় তুমি অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারো। এমনকি তোমরা পছন্দের গল্প, কবিতার বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদিও পড়তে পারো।

অনেকের খুব বেশি স্বপ্নদোষ হয় আবার অনেকের খুব কম স্বপ্নদোষ হয় এটা কেন?

কারো কারো স্বপ্নদোষ ঘন ঘন হয়, কারো কারো কম হয়। আবার কারো কারো হয়ই না। এ সবই স্বাভাবিক। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই।

বেড়ে ওঠা : মানসিক

যখন ছেলে মেয়ে বড় হওয়া শুরু করে তখন কেন মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য থেকে আলাদা হতে শুরু করে?

যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন সে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য তখন তার দেখাশুনা করেন। সে ধীরে ধীরে বড় হয়, বুঝতে শেখে, শারীরিক ও মানসিকভাবে তার বিভিন্ন পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তনের সময়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে বড় ভাবতে শুরু করে এবং নিজেদের মতো করে চলতে চায়। বেশির ভাগ সময়ে দেখা যায় যে, বাবা-মায়েরা তাদের এ চলাফেরা মেনে নিতে পারেন না। সে জন্যই এ সময়ে বড়দের সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হয়।

তবে এই সময় নিজের চিন্তা এবং সমস্যাগুলো যদি পরিবারের অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া যায় এবং সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা যায় তাহলে বিভিন্ন সমস্যা সহজে সমাধান করা যায়।

মা-বাবারা আগে আদর করতো, সুন্দরভাবে কথা বলতো, এখন কথাবার্তার মধ্যে শাসন করা ও বাধা দিতে দেখা যায়- এটা কেন?

ছেলেমেয়েরা যখন বড় হতে শুরু করে তখন মা-বাবারা তাদের প্রতি আরো বেশি নজর দেন। কারণ এই বয়সটা ভবিষ্যত গড়ার বয়স। দেখা যায় যে, এই বয়সে ছেলেমেয়েরা নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও আবেগের ফলে অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে থাকে। তাই সন্তানদের ভালোর জন্য ও নিরাপত্তার কথা ভেবে মা-বাবা এই বয়সে ছেলেমেয়েদের শাসন করেন, ঘরে বাইরে খেলতে যেতে বা একা একা বাইরে যেতে নিষেধ করেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের আচরণ বাবা-মার পছন্দ না হলে বাবা-মা তা শুধরে দিতে চান।

ধৈর্য ধরতে ও ভালোমন্দ বিচার করতে চেষ্টা করো

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন ঘটার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের মানসিক পরিবর্তন আসে। এ সময় তোমাদের মনে নানা প্রশ্ন আসে, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, কি করবো তা অনেক সময় বুঝতে পারো না। স্বাভাবিকভাবে শরীর, চেহারা, পোশাক ও আচার-আচরণ সম্পর্কে তোমরা সচেতন হয়ে ওঠো। ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন হয়ে থাকে। এ সময় তোমরা অনেকে নিজেদেরকে বড় ভাবতে শুরু করো এবং অন্যের কাছেও আশা করো যে, তারা তোমাদের বড় ভাবুক। তোমাদের মনে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার ভাবনা আসে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো চলতে ইচ্ছা করে। এভাবে নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলতে গিয়ে তোমরা অনেক ভুলও করে ফেলতে পারো। তাই ধৈর্য ধরতে ও ভালোমন্দ বিচারে সচেষ্ট হতে হবে। এই সময় নিজেদের চিন্তা এবং সমস্যাগুলো নিয়ে তোমরা যদি মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যদের সাথে কথা বলো তবে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করতে পারবে।

বন্ধুত্বের পাশাপাশি পড়াশুনাও করবে

এ সময় তোমাদের কারো কারো অনেক বন্ধু-বান্ধব থাকে। মেয়েরা ছেলেদের প্রতি এবং ছেলেরা মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করো। এ বয়সে তোমরা চারপাশের অনেক মজার জিনিস যেমন- সঙ্গীত, নাটক-উপন্যাস, সিনেমা, খেলাধুলা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি অনেক কিছু আবিষ্কার করে থাকো। এ সময় তোমরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারো এই ভয়ে অনেক বাবা-মা তোমাদের নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তবে এই বয়সে বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলামেশার প্রয়োজন রয়েছে। এই মেলামেশার মাধ্যমেই তোমরা সমাজ জীবনের সাথে পরিচিত হও এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে শেখো। তবে বন্ধু-বান্ধবের সাথে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করলে পড়াশুনা ও অন্যান্য স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষতি হতে পারে।

বাবা-মাকে বুঝতে চেষ্টা করো

বয়ঃসন্ধিকাল তোমাদের বেড়ে ওঠার সময়। এ সময়ে তোমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে চাও। বাবা-মার আদেশ-উপদেশ প্রায় সময়ই তোমাদের ভালো লাগে না। মনে করো বাবা-মা তোমাদের চিন্তাভাবনা, ইচ্ছা বা অনুভূতি বুঝতে পারেন না। অনেক সময় বাবা-মা তোমাদের সাথে একমত হন না বলে তোমাদের খারাপ লাগে। তবে, মনে রাখতে হবে যে, বাবা-মা তোমাদের সবচেয়ে আপনজন এবং তারা সবসময় তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন। তাই তাদের কথা তোমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

বাবা-মার সাথে সহজ হও, সমস্যা কমে আসবে

বাবা-মায়েরা বয়স্ক মানুষ এবং জীবন সম্পর্কে তাদের অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা ভালোভাবেই জানেন যে, সমাজে কেবল ভালো জিনিসই নেই, খারাপ জিনিসও রয়েছে। তোমাদের বেড়ে ওঠার সময় বাবা-মায়ের নির্দেশনা খুবই প্রয়োজন। মা-বাবার পরামর্শ ও উপদেশ তোমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে, সঠিক পথে চলতে এবং সুখী-সুন্দর জীবন গড়তে সহায়তা করবে। তাই এ সময়ে যদি নিজেদের সমস্যা নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে খোলাখুলি আলাপ করো এবং তাদের পরামর্শ নিয়ে চলো, তাহলে তোমাদের সমস্যা অনেক কমে আসবে।

বেড়ে ওঠা : সামাজিক

মা কোথাও যেতে নিষেধ করলে আমার খুব রাগ হয়, কেন বুঝতে চায় না মা? মা কেন অযথা সন্দেহ করে?

যখন একটি ছেলে বা মেয়ে ১০-১২ বছরে পৌঁছায় তখন তাদের শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়। এ রকম আরো অনেক মানসিক পরিবর্তন এবং সামাজিক বিষয়ের সাথে তাদের পরিচয় হয়। তাছাড়া এ সময়ে মনেরও পরিবর্তন হয় এবং ছেলেমেয়েরা নিজেদের ইচ্ছা মতো চলতে চায় এবং এতে করে তারা অনেক ভুল করতে পারে। ছেলেমেয়েরা যেন ভুল না করে, সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে সেজন্য বাবা-মা বিভিন্ন উপদেশ দেন এবং শাসন করেন। এ সময়ে সব ব্যাপারে যদি বাবা-মার সাথে খোলামেলা আলাপ করা হয়, তবে সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যায়।

আগে রাস্তাঘাটে খেলা করতাম, এখন পারি না, বাবা- মাকে জিজ্ঞেস করেছি কেন পারি না?

আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের সমান চোখে দেখা হয় না এবং তাদের সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। জন্মের পর থেকেই বিভিন্নভাবে তারা এ বৈষম্যের শিকার হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের সাথে বাবা-মা ও পরিবারের এ আচরণের তারতম্য আরো বেশি করে নজরে আসে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েটির অবস্থান ছেলেটির চেয়ে নিচে। যথাযথ সুযোগ পেলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই সমানভাবে যেকোনো কাজ করতে পারে।

নিরাপত্তা ও সম্মানের কারণে কিশোরী মেয়েদের ব্যাপারে বাবা-মা আরো বেশি চিন্তিত থাকেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বন্ধু/বান্ধবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে মেয়েদের ওপর বেশি বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেন। এ সময়ে মেয়েরা যাতে কোনো রকম যৌন নিপীড়নের শিকার না হয় সে ব্যাপারে বাবা-মা বিশেষভাবে সতর্ক থাকেন।

তোমরা যারা কিশোর-কিশোরী তারা সকল ব্যাপারে বাবা-মা, ভাই-বোন অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সাথে তোমরা একমত না হলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এতে তোমাদের সমস্যা দূর হবে এবং বাবা-মায়ের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

উত্ত্যক্ত করা

উত্ত্যক্ত করা কি স্বাভাবিক ব্যাপার? এটা কি আসলেই মজা করা?

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের কিছু দৈহিক পরিবর্তন ঘটে যা তাদেরকে পুরুষদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। তোমরা হয়তো জানো যে, ছেলেরা, এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও রাস্তাঘাটে মেয়েদের কিংবা মহিলাদের উত্ত্যক্ত করে থাকে। কোনো কোনো সময় মেয়েরাও ছেলেদের উত্ত্যক্ত করে থাকে। উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে এক ধরনের যৌন নিপীড়ন। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী উত্ত্যক্ত করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কেউ উত্ত্যক্ত করলে কি করবো?

তুমি যদি মেয়ে হও, রাস্তাঘাটে কেউ তোমাকে উত্ত্যক্ত করলে ভয় পাবার কিছু নেই। যদিও ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর। তারপরও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলাই এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ। স্কুল থেকে ফেরার পথে কিংবা অন্য কোথাও আসা-যাওয়ার সময় কয়েকজন মিলে একসাথে চলার চেষ্টা করো। এ ধরনের পরিস্থিতি কৌশলে মোকাবেলা করাই ভালো, যাতে উত্ত্যক্তকারী আরো বেশি প্রতিশোধ পরায়ন না হয়ে উঠতে পারে। যদি সমস্যা গুরুতর হয় সেক্ষেত্রে তোমার মা-বাবা এবং শিক্ষকদের জানাতে পারো। প্রয়োজনে আইনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

আজকাল মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে (যেমন- ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি) তরুণ ছেলেমেয়েদের প্রায়ই উত্ত্যক্ত করা বা যৌন হয়রানি করা হয়। এ সকল প্রযুক্তির অপব্যবহার করে গোপনে বা জোর করে কোনো কোনো উত্ত্যক্তকারী নানারকম আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও ধারণ করে ও ছড়িয়ে দেয় অথবা ছড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে।

মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে কেউ যেকোনো রকম উত্ত্যক্ত করলে নিজের মধ্যে চেপে না রেখে সাথে সাথে মা-বাবা বা অভিভাবককে জানাবে। তা না হলে এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। তাদের না জানানোর ফলে তোমার বাবা-মা ভুল বুঝতে পারেন। এমনকি তুমি তাদের সন্দেহের কারণও হতে পারো। বিষয়টি জানলে তারা তোমাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বও নেবেন। মনে রেখো, তোমার বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগে ফেইসবুক/টুইটার ব্যবহার করা বেআইনি।

তুমি যদি ছেলে হও, হতে পারে তোমার বন্ধুরাই বিভিন্নভাবে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করছে এবং তোমারও তাদের সাথে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা হতে পারে। মনে হতে পারে যে, এতে দোষের কিছু নেই, এটা কেবল মজা করা। কিন্তু সবারই জানা প্রয়োজন যে, সরাসরি অথবা মোবাইল বা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমেই হোক কাউকে উত্ত্যক্ত করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। এ ধরনের আচরণ কখনো কখনো যৌন নিপীড়ন এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের পর্যায়ে যেতে পারে যা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই এ ধরনের কাজ থেকে তুমি যেমন বিরত থাকবে, তোমার বন্ধুদেরও বিরত রাখবে।

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন

যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন কি?

অনেক সময় কিশোর-কিশোরী বিশেষ করে মেয়েদরকে রাস্তাঘাটে, বাসে বা অন্যান্য স্থানে ছেলেদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অশোভন ও অস্বস্তিকর আচরণ, কথাবার্তা, মন্তব্য কিংবা শারীরিক স্পর্শের সম্মুখীন হতে হয়। একে যৌন নিপীড়ন বলে। যৌন নিপীড়ন অনেকভাবেই হতে পারে। আজকাল তথ্য প্রযুক্তি যেমন- মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউব ইত্যাদি অপব্যবহার করেও অনেককে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হয়।

কেন মেয়েরাই যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়?

নারী-পুরুষ যে কেউ যেকোনো সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। তবে শিশু, কম বয়সি মেয়ে বা ছেলে এই অবস্থার মুখোমুখি হয় বেশি। দেখা গেছে পরিচিত লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনেরাই যৌন নিপীড়ন করে থাকে। সাধারণত যৌন নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সি ছেলেমেয়েদের ভয়, প্রলোভন, চাপ বা হুমকি দেয় এ ধরনের ঘটনা কাউকে না বলার জন্য। কিন্তু এ রকম হলে চুপচাপ না থেকে বা ভয় না পেয়ে অভিভাবক বা বড় কাউকে বলা উচিত এবং সেই সাথে সমবয়সি ও পরিচিতদেরও তার সম্বন্ধে বলে দেয়া উচিত যেন তারাও তার সম্বন্ধে সাবধান থাকতে পারে। মনে রাখবে যে যৌন নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, যাকে করা হয় তার কোনো দোষ নেই।

যৌন নিপীড়নের কি কোনো প্রতিকার নাই?

যৌন নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একা একা কারো সাথে মেলামেশা না করে বা বেড়াতে না গিয়ে কয়েকজন মিলে যাওয়া উচিত। এছাড়া যৌন নিপীড়ন করে এমন কারো সম্বন্ধে জানা থাকলে বা সে রকম সন্দেহ থাকলে তার সাথে একা গল্প করবে না, বা বেড়াতে যাবে না।

যৌন নিপীড়নের শিকার ছেলে বা মেয়েটির জন্য কি করা দরকার?

অনেক সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক মেয়ে বা ছেলে মানসিকভাবে কষ্ট পায়, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এ রকম ঘটনার শিকার হয় তবে এ অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দেবে, সমবেদনা জানাবে যেন সে এ অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব সময় মনে রাখবে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন একটি ঘৃণ্য অপরাধ, যে যৌন নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, তার সম্বন্ধে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে এবং নিজেদের সচেতন হয়ে চলতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধরনের যৌন নিপীড়নকারীদের জন্য দেশের প্রচলিত আইনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার ছেলেটি বা মেয়েটির দোষ নেই।

কীভাবে যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করবে

- আগ বাড়িয়ে কেউ বেশি আপনভাব দেখালে, সাহায্য বা উপকার করতে আসলে ভেবে-চিন্তে তা গ্রহণ করবে
- কাউকে ভালো লাগলে চট করে তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলবে না
- অচেনা কোনো নারী বা পুরুষের সাথে একা চলাফেরা করবে না
- কারো আচরণ বা কোনো কিছু অস্বস্তিকর মনে হলে তার সামনে কখনো একা যাবে না বা থাকবে না
- বিপরীত লিঙ্গের সমবয়সি, বয়স্ক আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা থেকে সাবধানে থাকবে
- একা একা চলাফেরা না করে যতদূর সম্ভব দল বেঁধে চলাফেরা করবে
- কোনো দ্বিধা, প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে। কেউ যৌন নিপীড়ন বা ধর্ষণ করলে বা এ অবস্থার মুখোমুখি হলে চুপচাপ না থেকে অভিভাবককে জানাবে
- পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে যৌন নিপীড়নকারীর কথা জানিয়ে দেবে যাতে সবাই তার কাছ থেকে সাবধানে থাকে।

আমার এক বান্ধবীর গায়ে তার এক শিক্ষিত আত্মীয় হাত দিয়েছিল। শিক্ষিত হয়েও সে এ কাজ কেন করলো?

তোমাদের মতো অনেক মেয়েদেরই এ ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। এ ধরনের আচরণ হচ্ছে এক ধরনের যৌন নিপীড়ন। যে কোনো ধরনের আচরণ, কথা বা শারীরিক ছোঁয়া- তা যার দ্বারাই হোক না কেন, যদি অস্বস্তিকর হয়, তবে তাকে যৌন নিপীড়ন বলা যেতে পারে। এ ধরনের যৌন নিপীড়ন যেকোনো জায়গায় যেমন- রাস্তাঘাটে, বাসে, কর্মক্ষেত্রে এমন কি বাসায়ও হতে পারে। নৈতিকতাহীন অনেক শিক্ষিত মানুষও এ ধরনের নিপীড়ন করতে পারে।

অনেক সময় নিকট আত্মীয় বা আপনজনও যৌন নিপীড়ন করতে পারে। অল্পবয়সি মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা যৌন নিপীড়নের শিকার বেশি হয়। যারা যৌন নিপীড়ন করে তারা অনেক সময় নানা ধরনের ভয় দেখায় যাতে এ ব্যাপারটা অন্যরা জানতে না পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা না করে অভিভাবক বা বড় যাদের সাথে সহজে কথা বলা যায়, তাদের জানানো উচিত। এটা কোনো মতেই চুপচাপ সহ্য করা উচিত নয়। যৌন নিপীড়ন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে।

যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কি করবে

- তাকে জানিয়ে দাও যে, তুমি এসব পছন্দ করো না এবং ব্যাপারটি অন্য কাউকে বলে দেবে
- তোমার বড় ভাই-বোন বা বাবা-মাকে এ সম্পর্কে জানাও
- ঐ মানুষটির সাথে আর কখনো একা হবে না
- সে অন্য কাউকে বলে দেবে বলে ভয় দেখালেও তার কথায় বিশ্বাস করবে না
- এ ব্যাপারে নিজেকে কখনো দোষী ভাববে না।

তথ্য ও সেবা পাওয়ার স্থান

আরও বেশি তথ্য জানতে ও স্বাস্থ্যসেবা পেতে যার/যাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে বইটি পড়ার পরও যদি তোমার আরও কিছু জানার থাকে তাহলে এমন কাউকে খুঁজে বের করো, যার উপর তোমার বিশ্বাস আছে এবং যার কাছ থেকে তুমি অনেক কিছু জানতে পারো। তিনি হতে পারেন তোমার বড় বোন, বড় ভাই, পরিবারের অন্য সদস্য, বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু অথবা তোমার এলাকার ক্লিনিকের একজন স্বাস্থ্যকর্মী। এভাবে তুমি কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে যা যা জানার তা জানতে পারবে।

এই বইয়ে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সে সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা বা পরামর্শের দরকার হলে তুমি নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করতে পারো:

- সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
  - কমিউনিটি ক্লিনিক
  - ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
  - উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
  - মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
  - জেলা সদর হাসপাতাল
  - সকল মেডিকেল কলেজে অবস্থিত মডেল ক্লিনিক
  - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ক্লিনিক
  - মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা
  - আজিমপুর এমসিএইচটিআই, ঢাকা
- দেশের বিভিন্ন এনজিও ক্লিনিক
- সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিক
- শহর এলাকায় রংধনু ক্লিনিক
- ব্র্যাক সুস্বাস্থ্য ক্লিনিক
- মেরী স্টোপস্ ক্লিনিক
- এসএমসি সুরক্ষা কেন্দ্র
- গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভালো ডিপোহোল্ডার ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং
- এসএমসির টেলি জিজ্ঞাসা।

ফোন : ০৯৬১২০১২৩৪৫, ০৯৬১২০০০১১১

হট লাইন : ১৬৩৮৭

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সেবাকেন্দ্রে গিয়ে এমন কাউকে খুঁজে নেয়া যার কাছে প্রশ্ন করতে বা সেবা নিতে তুমি স্বস্তি বোধ করো।

মনে রেখো, এই সবই তোমার ভালোর জন্য। তাই তোমাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হলে তোমাকে তাদের কাছে গিয়ে দেখা করতে হবে।

USAID

আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

NGO Logo

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
আইইসি টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদনক্রমে বিসিসিপি কর্তৃক প্রণীত

এখানে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে ইউএসএআইডি'র মতের মিল না-ও থাকতে পারে।

ISBN # 984-757-071-10